IslamHouse.com

পবিত্র কুরআনের আলোকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালাত

মো: আব্দুল কাদের

প্রবন্ধটিতে পবিত্র কুরআনের আলোকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরণের উদ্দেশ্য, তাঁর রিসালাত-সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক বক্তব্য এবং রিসালাতের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরার

প্রয়াস চালানো হয়েছে। মূল প্রবন্ধটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত।

https://islamhouse.com/৩৩৪২৬৬

- পবিত্র কুরআনের আলোকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত
    - পবিত্র কুরআনের আলোকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত
    - ক. রিসালাতের পরিচয়

- খ. নবী-রাসূলগণের প্রেরণের উদ্দেশ্য
- গ. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাত সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক বক্তব্য
- ঘ. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ
- ৩। আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী
- উপসংহার

পবিত্র কুরআনের আলোকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত

IslamHouse.com

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

ড. মোঃ আব্দুল কাদের

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

পবিত্র কুরআনের আলোকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত

মানব জাতিকে সঠিক পথের দিশা দিতে যুগে যুগে এ ধরাধামে অসংখ্য মহামানবের আগমন ঘটেছে। তারা মহান আল্লাহর বাণী লাভে ধন্য হয়ে মানুষকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করার

প্রয়াস পেয়েছেন। এসব মহা মানব আল্লাহ তা‘আলার একান্ত বান্দারূপে রিসালাত লাভে ধন্য হয়েছেন।

রিসালাত কোনো শিক্ষা, যোগ্যতা বা অর্জনযোগ্য বিষয়ের নাম নয়। দক্ষতা, মেধা বা প্রতিভা দিয়ে এটি লাভ করা যায় না। চর্চা, অধ্যবসায়, অনুশীলন ও সাধনা দ্বারা দুনিয়ার অনেক কিছু অর্জন সম্ভব হলেও নবুওয়াত ও রিসালাত অর্জন সম্ভব নয়। এটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা‘আলার মনোনয়ন। মহান আল্লাহর পয়গাম মানব জাতির কাছে বহন করে আনা এবং তা প্রচার করার উদ্দেশ্যেই

আল্লাহ নবী-রাসূল মনোনীত করেন। এ মর্মে কুরআনে এসেছে:

﴿ٱللَّهُ يَصۡطَفِي مِنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلٗا وَمِنَ ٱلنَّاسِ﴾ [الحج: ٧٥]

“আল্লাহ ফিরিশতার ও মানবকুল থেকে রাসূল মনোনীত করে থাকেন।” [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ৭৫]

এ আয়াতে যে সত্যটি ফুটে উঠেছে তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ٤﴾ [النجم: ٣، ٤]

“প্রত্যাদেশকৃত ওহী ভিন্ন তিনি মন থেকে কোনো কথা বলেন না।” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৩-৪]

তাঁর রিসালাত ছিল পূর্ণাঙ্গ, অনন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, সুপরিকল্পিত ও সুনিপুণ কর্মকৌশলে ভরপুর। তিনি বিশ্বের বুকে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ দা‘ঈ। বিজয়ী বীর, সফল রাষ্ট্রনায়ক, কৃতী পুরুষ, মহামনীষী, বিজ্ঞানী ও সংস্কারক হিসাবে সমাদৃত। জন্মের পূর্ব থেকেই তিনি অনন্য ও অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর রিসালাত লাভের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ফলে

প্রবন্ধটিকে আমরা নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করতে পারি।

ক. রিসালাতের পরিচয়

খ. নবী রাসূলগণের আগমনের উদ্দেশ্য

গ. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক বক্তব্য

ঘ. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ।

ক. রিসালাতের পরিচয়

রিসালাত আরবী শব্দ, যার মূল ধাতু হলো (ر س ل) রা, সিন, লাম। সাধারণ অর্থে যা কিছু প্রেরণ করা হয় তাকেই আমরা রিসালাত বলে জানি। যেমন কোনো চিঠি প্রেরণ। এটি একবচন, বহুবচনে الرسالات বা رسائل ব্যবহৃত হয়। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে রিসালাতের শাব্দিক অর্থ হলো: বার্তাবহন বা দৌত্যকার্য।[১] সম্বোধন বা খিতাব, কিতাব,[২] লিখিত ছহীফা,[৩] লিখিত বিষয়বস্তু বা মাকতুব।[৪] বক্তব্য যা কোনো ব্যক্তি অন্যের নিকট প্রাপ্ত হয়ে বহন করে নিয়ে আসে, চাই সেটা লিখিত হোক অথবা অলিখিত[৫] প্রভৃতি।

ইংরেজীতে একে Message, letter, Note, dispatch, communication বলা হয়।[৬]

ইসলামী শরী‘আতের পরিভাষায় আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন স্বীয় বান্দাদের হিদায়াত লাভের নিমিত্তে তাদের মধ্যে মনোনীত বান্দার মাধ্যমে যে বাণী পাঠিয়েছেন তাকেই রিসালাত বলে। আর যারা এর বাহক তারা হলেন রাসূল। মহান আল্লাহ্ একান্ত স্বীয় ইচ্ছায়ই তাদের মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। এ সম্পর্কে কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنَّهُمۡ عِندَنَا لَمِنَ ٱلۡمُصۡطَفَيۡنَ ٱلۡأَخۡيَارِ ٤٧﴾ [ص: ٤٧]

‘‘অবশ্যই তারা ছিল আমার মনোনীত উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।’’[সূরা ছোয়াদ, আয়াত: ৪৭]

অতএব, আল্লাহ তা‘আলা যাঁদেরকে মনোনীত করেন তাঁদের মধ্যে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা ও গুণাবলী জন্মগত ও স্বভাবগতভাবেই সৃষ্টি করে দেন। মক্কার কাফিররা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাতের অস্বীকৃতি জানাতে চাইলে অত্যন্ত দীপ্ত কণ্ঠে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন:

﴿ٱللَّهُ أَعۡلَمُ حَيۡثُ يَجۡعَلُ رِسَالَتَهُۥ﴾ [الانعام: ١٢٤]

“আর আল্লাহ তাঁর রিসালাতের ভার কার ওপর অর্পণ করবেন তা তিনিই ভালো জানেন।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১২৪]

সুতরাং এটি কোনো অর্জনীয় বিষয় নয়। বরং মহান আল্লাহ প্রদত্ত মানবজাতির প্রতি এক সীমাহীন নি‘আমত।

সুতরাং মহান রাব্বুল ‘আলামীনের তরফ থেকে জগতবাসী বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন জীবের নিকট বার্তা পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমকে বলা হয় রিসালাত। এই দৌত্যকার্য সম্পন্ন করার কাজে দু-শ্রেণির লোক নিয়োজিত রয়েছেন।

তারা হলেন- ফিরিশতা ও মানুষ, যাদেরকে রাসূল বা দূত হিসেবে অভিহিত করা হয়। আদিকাল হতেই আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক জাতির প্রতিই তাদের হিদায়াতের জন্য সতর্ককারী রাসূল পাঠিয়েছেন। এ মর্মে আল-কুরআনে এসেছে:

﴿وَإِن مِّنۡ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٞ﴾ [فاطر: ٢٤]

‘‘আর এমন কোনো জাতি নেই যাদের কাছে সতর্ককারী বা ভীতি প্রদর্শক প্রেরিত হয় না।’’ [সূরা ফাতির, আয়াত: ২৪]

অন্যত্রে এসেছে:

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولٞ﴾ [يونس: ٤٧]

‘‘আর প্রত্যেক উম্মতের জন্যই রয়েছে রাসূল।’’ [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৪৭]

খ. নবী-রাসূলগণের প্রেরণের উদ্দেশ্য

মহান আল্লাহ তা‘আলা এ পৃথিবীর লালনকর্তা, পালনকর্তা, সৃষ্টিকর্তা। তিনি সমুদয় বস্তুর মালিক ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর এ সকল গুণাবলী ও মহাপরাক্রম ক্ষমতা নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রয়োজনীয়তাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে দিয়েছে। কেননা, এ সকল বিষয়ে মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত, অথচ আল্লাহ তা‘আলা অসীম। তাঁর এ

অসীম ও পরাক্রমশালী যাবতীয় গুণাবলীর পরিচয় সম্পর্কে নবী-রাসূলগণ অবগত ছিলেন। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীলব্ধ জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে সমুদয় বিষয়ে মানুষকে হিদায়াত দিয়েছেন। মানুষকে আল্লাহর রুবুবিয়্যাত সম্পর্কে পরিচয় লাভ করা ও সঠিক পথের দিশা দিয়ে পার্থিব ও পরকালীন জীবনের কল্যাণ ও সৌভাগ্যলাভের পথ সম্পর্কে জ্ঞান দানের জন্য রাসূলগণের আগমন হয়েছে।[৭] আল্লাহ তা‘আলা নবী-রাসূল প্রেরণের পটভূমি ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ٢١٣﴾ [البقرة: ٢١٣]

‘‘সকল মানুষ একটি জাতি সত্ত্বার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা নবীগণকে পাঠালেন সুসংবাদ দাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী হিসেবে। আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুতঃ কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করে না। কিন্তু

পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদ বশতঃ তারাই করেছে, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ ঈমানদারদেরকে হিদায়াত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপার তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২১৩]

উপরোক্ত আয়াতগুলোর মর্মার্থ অনুধাবনে বোধগম্য হয় যে, কোনো এক কালে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একই মতাদর্শ ও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৮] সবাই একই ধরণের বিশ্বাস ও আকীদা পোষণ করত। অতঃপর তাদের

মধ্যে আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার বিভিন্নতা দেখা দেয়। ফলে, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ তা‘আলা সত্য ও সঠিক মতবাদকে প্রকাশ করার জন্য এবং সঠিক পথ দেখাবার লক্ষ্যে নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেন এবং তাদের প্রতি আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেন। নবীগণের চেষ্টা, পরিশ্রম ও তাবলীগের ফলে মানুষ দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ও তাদের প্রদর্শিত সত্য-সঠিক পথ ও মতকে গ্রহণ করে নেয়, আর একদল তা প্রত্যাখ্যান করে। প্রথমোক্ত দল নবীগণের অনুসারী

এবং মুমিন বলে পরিচিত, আর শেষোক্ত দলটি নবীগণের অবাধ্য, অবিশ্বাসী এবং কাফির হিসেবে গণ্য।

অতএব বলা যায় যে, আল্লাহ তা‘আলা যে অসংখ্য নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব প্রেরণ করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল ‘‘মিল্লাতে ওয়াহেদা’’ ত্যাগ করে যে মানব সমাজ বিভিন্ন দল ও ফিরকাতে বিভক্ত হয়েছে তাদেরকে পুনরায় পূর্ববর্তী ধর্মের আওতায় ফিরিয়ে আনা। নবীগণের আগমনের ধারাটিও এভাবেই চলছে। যখনই মানুষ সৎপথ থেকে দূরে সরে গেছে, তখনই হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা‘আলা কোনো না কোনো নবী প্রেরণ

করেছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন, যেন তাঁর অনুসরণ করা হয়। আবার যখন তারা পথ হারিয়েছে তখন অন্য একজন নবী পাঠিয়েছেন এবং কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এর ধারাবাহিকতায় সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ ধরাধামে আগমন ঘটেছে।

গ. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাত সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক বক্তব্য

ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম। এর বাহক হলেন

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি তাঁর জীবনের সমুদয় সময় ও ক্ষণকে দীনের প্রচার ও প্রসারের নিমিত্তে অতিবাহিত করেছেন। দীন প্রচারের সুমহান দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেছেন। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে এসেছে:

﴿هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ٢﴾ [الجمعة: ٢]

রক্ষরদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ পড়ে শুনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমত

শিক্ষা দেন। অথচ ইতোপূর্বে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল।’’ [সূরা আল-জুমু‘আ, আয়াত: ২]

সুতরাং আয়াতসমূহের তিলাওয়াত, আত্মার পরিশুদ্ধি, কিতাবুল্লাহ তথা কুরআনের শিক্ষাদান বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা, উন্নত নৈতিকতা ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের গুরুদায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছিল। তাঁর আগমনের প্রাক্কালে আরবের লোকেরা ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস থেকে মুক্তি দিয়েছেন। কেননা তাঁর রীতি বা সুন্নাত হলো, কোনো যালিম সম্প্রদায়কে ধ্বংস

করার পূর্বে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা, যিনি তাদেরকে সত্য ও সঠিক পথের দিকে আহ্বান করবেন। এ মর্মে সূরা আল-কাসাসে এসেছে:

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهۡلِكَ ٱلۡقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبۡعَثَ فِيٓ أُمِّهَا رَسُولٗا يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِنَاۚ وَمَا كُنَّا مُهۡلِكِي ٱلۡقُرَىٰٓ إِلَّا وَأَهۡلُهَا ظَٰلِمُونَ ٥٩﴾ [القصص: ٥٩]

“ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত তার কেন্দ্রস্থলে রাসূল প্রেরণ না করেন। যিনি তাদের কাছে আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন তার বাসিন্দারা যুলুম করে।’’ [সুরা আল-কাসাস, আয়াত: ৫৯]

অতএব, আল্লাহ প্রদত্ত ওহীর জ্ঞান মানুষের মাঝে প্রচার করার মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়কে মুক্তির অমীয় সুধা পানের জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানবজাতিকে আল্লাহর ভীতিপ্রদর্শন ও জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন, যাতে মানুষেরা অকল্যাণকর ও যাবতীয় অবৈধ পন্থা অবলম্বন থেকে দূরে থাকে।[৯] মূলতঃ এ সুসংবাদ ও ভীতিপ্রদর্শক রূপেই আল্লাহ তা’আলা যুগে যুগে নবী-রাসূলদের এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, যেন মানব জাতি কিয়ামতের

দিন এ আপত্তি করতে না পারে যে, হে আল্লাহ! কিসে তোমার সন্তুষ্টি এবং কিসে অসন্তুষ্টি তা আমরা অবগত ছিলাম না। যদি আমরা জানতাম তা হলে সে অনুসারে জীবন পরিচালনা করতাম। এ ধরণের কোনো দলীল বা প্রমাণ যেন মানুষ উপস্থাপন করতে না পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আল্লাহ নবী-রাসূলগণের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿رُّسُلٗا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمٗا ١٦٥﴾ [النساء: ١٦٥]

‘‘আমি সুসংবাদ দাতা ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূল

আগমনের পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।’’ [সূরা আন-নিসা, আয়াত, ১৬৫]

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা বিশ্বের জন্য ভীতিপ্রদর্শক-রূপে প্রেরিত হয়েছেন, যেন আহলে কিতাবরা (ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান) অভিযোগ উত্থাপন করতে না পারে যে, আমাদের কাছে কোনো সুসংবাদ দাতা ও ভীতিপ্রদর্শক আসে নি।[১০] এ মর্মে সূরা ত্বা-হায় এসেছে, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَوۡ أَنَّآ أَهۡلَكۡنَٰهُم بِعَذَابٖ مِّن قَبۡلِهِۦ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوۡلَآ أَرۡسَلۡتَ إِلَيۡنَا رَسُولٗا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ مِن قَبۡلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخۡزَىٰ ١٣٤﴾ [طه: ١٣٤]

“যদি আমরা এদেরকে ইতোপূর্বে কোনো শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম, তবে এরা বলত: হে আমাদের রব! আপনি আমাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন না কেন? তাহলে তো আমরা অপমানিত ও হেয় হওয়ার পূর্বেই আপনার নিদর্শনসমূহ মেনে চলতাম।” [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ১৩৪] তাঁর আগমনের পূর্বে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোনো ভীতি প্রদর্শক আগমন করেনি। ফলে মানুষের সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করার অনুভূতি

পর্যন্ত লোপ পেয়ে যায়। এ জন্যে মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেন সর্বশেষ ভীতিপ্রদর্শক ও সুসংবাদ দাতা রূপে। আর এটি ছিল বান্দার প্রতি মা‘বুদের রহমত বা করুণা স্বরূপ।[১১]

নবুয়ত লাভের প্রারম্ভে তিনি এ মর্মে আদিষ্ট হয়েছেন এবং সর্বপ্রথম নিজ পরিবার ও নিকটতম আত্মীয়স্বজনকে আল্লাহর আযাবের ভয় প্রদর্শন করেন। তাঁর উপর নাযিলকৃত আসমানী কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কুরআনেও বিষয়টি এমনভাবে ধ্বনিত হয়েছে, যা প্রমাণ করছে যে, কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যও তাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজেই এ কথার স্বীকৃতি দিয়েছেন এভাবে,

﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ﴾ [الانعام: ١٩]

““আমার প্রতি এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে আমি তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এ কুরআন পৌঁছেছে সবাইকে ভীতি প্রদর্শন করি।’’ [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৯]

এ পৃথিবীতে মানুষের চলার পথ দু’টি। একটি হলো সরল সঠিক পথ বা সিরাতুল মুস্তাকীম। অপরটি গোমরাহীর পথ। এ দু’পথের যে কোনো পথে মানুষ পরিচালিত হতে

পারে। এজন্য পরকালেও জান্নাত এবং জাহান্নাম এ দু’ধরণের ব্যবস্থা রয়েছে। পবিত্র কুরআন গোটা জাতিকে মুমিন এবং কাফির দু’শ্রেণিতে বিভক্ত করেছে। মুমিনগণ কিসের ভিত্তিতে জীবন চালাবেন এবং কোনটি তাদের জীবন নির্বাহের পথ, সে বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাই তাঁর আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে ‘‘সিরাতুল মুস্তাকীম’’-এর পথ দেখানো। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّكَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ٣ عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ٤﴾
[يس: ٣، ٤]

“নিশ্চয় আপনি প্রেরিত রাসূলগণের একজন। সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।” [সূরা ইয়াসিন, আয়াত: ৩-৪]

ঘ. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাত ছিল অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তিনি সার্বজনীন, পূর্ণাঙ্গ ও সর্বকালের সব মানুষের জন্য যুগোপযোগী আলোকবর্তিকা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। নিম্নে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের আলোকে

তাঁর রিসালাতের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ বিধৃত হলো:

১। সার্বজনীন

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো বিশেষ সময় ও কোনো বিশেষ অঞ্চলের জন্য প্রেরিত হন না। তিনি সমগ্র জাহানের মানুষের কল্যাণের নিমিত্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পূর্ববর্তী সকল নবী রাসূল কোনো বিশেষ অঞ্চল বা বিশেষ গোত্রের প্রতি হিদায়াতের আলোকবর্তিকা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন

বিশ্ববাসীর জন্য ও অনাগত সীমাহীন সময়ের জন্য সর্বশেষ রাসূল। সুতরাং তাঁর রিসালাতও ছিল সার্বজনীন ও ব্যাপক। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا﴾ [الاعراف: ١٥٨]

“বলুন হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সবার প্রতিই আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৭৫]

আলোচ্য আয়াতটি মক্কী যুগে অবতীর্ণ আয়াতসমূহের অন্যতম। অতএব বলা যায় যে, মহানবী

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াতী কার্যক্রমের সূচনাই বিশ্বজনীন প্রকৃতি নিয়ে শুরু হয়েছে।[১২] তাঁর প্রেরণের উদ্দেশ্য বিধৃত করতে গিয়ে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧﴾ [الانبياء: ١٠٧]

“‘আমি আপনাকে সমগ্র জগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।’’ [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭]

এছাড়াও বিদায় হজের ভাষণে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে হে মানবজাতি বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি অনেক বাদশা

ও সম্রাটের নিকট দাওয়াত দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। স্বীয় সাহাবীগণ সারা বিশ্বময় দাওয়াত নিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসাবে তাঁর রিসালাত ছিল পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত। তাইতো মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا﴾ [المائدة: ٣]

“আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য একমাত্র দীন হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করলাম।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৩]

২। সত্যের সাক্ষ্যদাতা

সত্য ও সুন্দরকে গ্রহণ করা মানুষের ফিতরাত বা স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম মানুষকে সত্যের পথে আমরণ থাকার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি সত্যের সাক্ষ্যরূপে নমুনা পেশ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে থাকে। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যের বাস্তব নমুনার মূর্ত প্রতীকরূপে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে সমাজে সমাদৃত ছিলেন। এ মর্মে আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ رَسُولٗا شَٰهِدًا عَلَيۡكُمۡ كَمَآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ رَسُولٗا ١٥﴾ [المزمل: ١٥]

“আমি তোমাদের প্রতি রাসূল পাঠিয়েছি সত্যের সাক্ষ্যস্বরূপে, যেমন সাক্ষ্যস্বরূপে রাসূল পাঠিয়েছিলাম ফির‘আউনের প্রতি।” [সূরা আল-মুজ্জাম্মিল, আয়াত: ১৫]

এই শাহাদাত মূলতঃ দাওয়াতেরই একটা বাস্তব রূপ। জীবন্ত নমুনা পেশ করার মাধ্যমে যুগে যুগে নবী রাসূলগণ তাদের দাওয়াতকে মানুষের সামনে বোধগম্য ও অনুসরণ-যোগ্য বানাবার চেষ্টা করেছেন। তারা সবাই দুই উপায়ে এ সাক্ষ্য প্রদান করেন।

এক. তারা আল্লাহর দীনের পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন, এটা মৌখিক সাক্ষ্য।

দুই. তারা যা বলছেন তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। এটা বাস্তব সাক্ষ্য।

মক্কী জীবনের চরম প্রতিকূল পরিবেশে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অল্প সংখ্যক সাথী পেয়েছিলেন তারা আল্লাহর নবীর দাওয়াত কবুল করে নিজেরাও দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং এ দাওয়াতের কাজে নিজেদের বাস্তব সাক্ষ্যরূপে গড়ে তোলেন। এরই ফলশ্রুতিতে শাহাদাত আলান্নাস

উম্মতে মুহাম্মাদীর অন্যতম দায়িত্বও বটে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاۗ﴾ [البقرة: ١٤٣]

“এভাবে আমরা তোমাদের একটি উত্তম জাতিরূপে গড়ে তুলেছি, যাতে করে তোমরা গোটা মানব জাতির জন্য সত্যের সাক্ষ্যদাতা হতে পার এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন তোমাদের সাক্ষ্য বা নমুনা হন।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৪৩]

৩। আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী

তিনি স্বয়ং ছিলেন দা‘ঈ ইলাল্লাহ। তাঁর আন্দোলন, সংগঠন, সংগ্রাম সবকিছুর সারকথা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা, মানুষকে ঘোর তামাশাচ্ছন্ন কুফরী ও শির্কের অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আহ্বান জানাতেন তিনি। সমগ্র বিশ্ববাসীকে তিনি ইসলামের সুশীতল ছায়ার দিকে আহ্বান জানাতেন। শুধু তাই নয়, সুদীর্ঘ তের বছর একনিষ্ঠভাবে মক্কী জীবনে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার পর তিনি মদীনায় হিযরত করেন। সেখানে দাওয়াতী মিশনের তিনি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। সংগঠিত করলেন

মানবজাতিকে, দূত পাঠালেন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে। মহান রাব্বুল আলামীনের একত্ববাদের সুমহান বাণী ছড়িয়ে দিল তাঁর অসংখ্য শিষ্য পৃথিবীর দিক দিগন্তে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল ইসলামের সুমহান আহ্বান, দাওয়াতের অমীয় সুধা পান করে দলে দলে লোকজন ইসলামের সুমহান ছায়াতলে আশ্রয় নিল। জড় হল একত্ববাদের পতাকাতলে। একাকার হয়ে গেল সব ব্যবধান, ঘুঁচে গেল সব অন্ধকার ও জুলমাত। করতলগত হল সমগ্র বিশ্ব। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে এসেছে:

﴿إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ ١ وَرَأَيۡتَ ٱلنَّاسَ يَدۡخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفۡوَاجٗا ٢﴾ [النصر: ١، ٢]

‘‘যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় তখন আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবেন।’’ [সূরা আন-নাসর, আয়াত: ১-২]

ইসলামী দাওয়াহ কার্যক্রমের মাঝেই যে ইসলামের প্রাণশক্তি। সারাজীবন তিনি স্বীয় কর্মকাণ্ড দ্বারা তা প্রমাণ করে গেছেন। জীবন সায়াহ্নে বিদায় হজের ভাষণেও তিনি স্বীয় অনুসারিদেরকে এ কর্মকাণ্ড

পরিচালনার জন্য দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন:

«بلغوا عني ولو آية»

“একটি আয়াত হলেও আমার পক্ষ থেকে (অন্যের নিকট) পৌঁছে দাও।’’[১৩] সূরা ইউসুফে তো এটাকেই একমাত্র কাজ বা প্রধানতম কাজ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে:

﴿قُلۡ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ﴾ [يوسف: ١٠٨]

বলো এটাই আমার পথ যে, আমি আল্লাহর দিকে আহবান জানাই। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০৮] মূলতঃ এটি ছিল রাব্বুল আলামীনের ঘোষণারই প্রতিফলন। তিনি বলেন,

﴿ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ﴾ [النحل: ١٢٥]

‘‘আল্লাহর পথে মানুষকে হিকমত ও উত্তম উপদেশ সহকারে দাওয়াত দাও।’’ [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৫]

﴿فَذَكِّرۡ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٞ ٢١ لَّسۡتَ عَلَيۡهِم بِمُصَيۡطِرٍ ٢٢﴾ [الغاشية: ٢١، ٢٢]

‘‘হে রাসূল! আপনি তাদেরকে উপদেশ দিন, আপনি কেবল উপদেশদাতা, আপনাকে দারোগা বানিয়ে পাঠানো হয় নি যে আপনি তাদের বাধ্য করবেন।’’ [সূরা আল-গাশিয়াহ, আয়াত: ২১-২২]

অন্যত্র এসেছে:

﴿فَإِنَّمَا عَلَيۡكَ ٱلۡبَلَٰغُ﴾ [النحل: ٨٢]

‘‘অতঃপর নিশ্চয় আপনার দায়িত্ব শুধু পৌঁছানো।” [সূরা আর-রাদ, আয়াত: ৪০]

৪। সুসংবাদ-দাতা

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত লাভের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মানব জাতির কল্যাণ ও শান্তি বিধানের নিমিত্তে জান্নাতের সুসংবাদ দান। আল্লাহর দীন কবুল করে মানুষ দুনিয়ায় ও আখিরাতে কী কী কল্যাণ পাবে এ ব্যাপারে মানুষকে অভিহিত করা তার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত

দরদ ভরা মন নিয়ে আবেগেপূর্ণ ভাষায় উপস্থাপন করতেন। ফলে মানুষ তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে দীন গ্রহণে উৎসাহ উদ্দীপনা ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা অনুভব করে। এ লক্ষ্যেই পবিত্র কুরআন তাঁকে ‘বাসীর’ বলে সম্বোধন করেছে। স্বয়ং তিনি নিজে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করত: উম্মতে মুহাদীকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে তা গ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন:

يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا

‘‘তোমাদেরকে সহজ পন্থা কার্যকর করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠোরতা

আরোপের জন্য নয়। তোমরা সুসংবাদ দাও, ভীতিপ্রদর্শন করো না।’’[১৪]

৫। ভয়ভীতি প্রদর্শন

আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে نذير (ভীতিপ্রদর্শক) রূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি স্বজাতিকে আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তির ভয় প্রদর্শন করতেন। ভয়ভীতি মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত হতে সাহায্য করে। যখন মানুষ ভয়হীন হয়ে এ পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করে তখন তার দ্বারা যে কোনো ধরণের অন্যায় হতে বিরত থাকতে পারে এবং সকল সঠিক পথের দিশা পায়। সেজন্যে

আল্লাহ তা‘আলা যুগে যুগে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে তাদের অনুভূতিকে জাগ্রত করেছেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে স্বয়ং একজন প্রকাশ্য ভীতিপ্রদর্শকরূপে স্বজাতির কাছে পেশ করেছেন। এ মর্মে তিনি ওহী লাভের প্রাক্কালে আল্লাহর পক্ষ হতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন, ﴿قُمۡ فَأَنذِرۡ ٢﴾ [المدثر: ٢] “হে নবী! আপনি উঠুন এবং সতর্ক করুন।” [সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ২] ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জাতিকে জাহান্নামের কঠিন আযাব সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন

করে দিয়েছেন। সহীহ মুসলিম শরীফে এ মর্মে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ। আয়াতখানি নাযিল হয়, তখন তিনি কুরাইশদের সকল গোত্রকে একত্রিত করে প্রত্যেক গোত্রের নাম ধরে বলতে লাগলেন, হে বনী কা‘ব ইবন লুয়াই! তোমরা তোমাদের নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। এভাবে তিনি মুররাহ ইবন কা‘ব, আবদে শামস, আবদে মানাফ, হাশেম, বনী আব্দুল মোত্তালিবের বংশধরকে সমভাবে আহবান জানান। এমনকি স্বীয় কন্যা

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকেও একই সম্বোধন করেন এবং পরকালে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রক্তের সম্পর্কের হওয়া সত্ত্বেও কোনো কাজে আসবে না মর্মে তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলেন।[১৫] ফলে একথা সহজেই অনুমেয় যে, ভয়-ভীতি প্রদর্শন দাওয়াতের অন্যতম একটি মাধ্যম। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ এ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ঐ সকল ভয়-ভীতি সম্পন্ন লোকদের জন্যই উপদেশস্বরূপ। এ মর্মে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿طه ١ مَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لِتَشۡقَىٰٓ ٢ إِلَّا تَذۡكِرَةٗ لِّمَن يَخۡشَىٰ ٣﴾ [طه: ١، ٣]

‘‘ত্বা-হা! আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্য আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করি নি, কিন্তু এটা তাদেরই উপদেশের জন্য যারা ভয় করে।’’ [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ১-৩]

তাছাড়াও এ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মানব জাতির জন্য অসংখ্য সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, যেন মানবজাতি উপদেশ গ্রহণ করে এবং নিজেদের অনুভূতি জাগ্রত রাখে।[১৬]

৬। আলোকবর্তিকা

মানুষের জন্য দু’টি জীবন রয়েছে, একটি ইহ-লৌকিক আর একটি পারলৌকিক। উভয় জীবনের কল্যাণ শান্তি ও মুক্তি নিশ্চিত করার জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরাধামে আগমন করেছেন। বর্বর, অসভ্য, কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাহিলিয়াতের ঘোর অমানিশায় তাঁর রিসালাত ছিল আলোকবর্তিকা স্বরূপ।সে সমাজে মানুষেরা ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য করার মতো জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, রীতিমত অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ছিল, সে সমাজে আলোর মশাল জ্বালিয়েছিলেন তিনি। তাঁর আগমনে

মানুষের মর্যাদা নিশ্চিত হয়। সমাজে অন্যায় অশান্তি দূরীভূত হয়ে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহ, কলহ ও সন্ত্রাসের মোকাবিলায় সন্ধি স্থাপিত হয়। তাইতো মহান আল্লাহ তাঁর রিসালাতকে (منيرا سراجا) উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে আখ্যা দিয়েছেন। কুরআনে এসেছে:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا ٤٥
وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذۡنِهِۦ وَسِرَاجٗا مُّنِيرٗا ٤٦﴾
[الاحزاب: ٤٥، ٤٦]

‘‘হে নবী! আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদ দাতা, ভীতি

প্রদর্শক ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।’’ [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৪৫-৪৬]

৭। আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধিকরণ

দেহ ও হৃদয় উভয়ের সমন্বয়ে একজন মানব। তাই মানুষের দেহের যেমনি চাহিদা রয়েছে, তেমনি হৃদয় ও আত্মারও চাহিদা রয়েছে। জন্মগতভাবেই মহান আল্লাহ মানুষের প্রকৃতিতে ভাল ও মন্দ উভয় কাজ করার ইচ্ছা ও প্রবণতা দিয়েছেন। এ মর্মে কুরআনে এসেছে:

﴿وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّىٰهَا ٧ فَأَلۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىٰهَا ٨﴾ [الشمس: ٧، ٨]

‘‘এবং শপথ মানুষের এবং তার যিনি তাকে সুঠাম করেছেন অতঃপর তার মধ্যে পাপ ও পুণ্য উভয়ের প্রবণতা নিহিত করে দিয়েছেন।’’ [সূরা আশ-শামস, আয়াত: ৭-৮]

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পাপ ও পুণ্যের এই সংঘর্ষ আদম ‘আলাইহিস সালামের সময় হতে চলে আসছে। এবং কিয়ামত অবধি চালু থাকবে।

এই সংঘর্ষে আধ্যাত্মিক শক্তি মানুষকে এমন কাজে উৎসাহিত করে যা পাপের উপর বিজয়ী হতে থাকে। আর এভাবে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়। এটি একমাত্র তাযকিয়া তথা

আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির মাধ্যমেই সম্ভব। এ তাযকিয়ার দিকে আহবান জানিয়ে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন:

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ٩ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ١٠ كَذَّبَتۡ ثَمُودُ بِطَغۡوَىٰهَآ ١١﴾ [الشمس: ٩، ١١]

‘‘নিশ্চয় যে সফলকাম হল যে আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন করল, আর যে ব্যর্থ হলো সে নিজেকে কলুষিত করল।’’ [সূরা আশ-শামস, আয়াত: ৯-১১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধি করণ। তিনি স্বয়ং প্রশিক্ষণ দানের

মাধ্যমে বিভিন্ন উপায় উপকরণ অবলম্বন পূর্বক তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেছিলেন। মূলতঃ এটা রিসালাতের অন্যতম গুরু দায়িত্ব। যুগে যুগে সকল নবী-রাসূলকে এ দায়িত্ব দিয়ে মহান আল্লাহ প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেছেন:

﴿كَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِيكُمۡ رَسُولٗا مِّنكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمۡ﴾ [البقرة: ١٥١]

“যেমন আমরা তোমাদের থেকেই তোমাদের মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছি। সে তোমাদের কে আমার আয়াত পড়ে শুনাবে, তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও বিকশিত করে তুলবেন।”

[সুরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৫১]

অতএব, মানবিক জীবনে আধ্যাত্মিক দিকটি মৌলিক ও অন্যতম প্রধান দিক। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন:

«الا ان فى الجسد لمضفة اذا صلحت صلح الجسد كله واذافسد الجسد كله الا وهى القلب»

‘‘নিশ্চয় মানুষের শরীরে একটি টুকরা আছে, এটা যদি ভাল হয় তবে সারা শরীর ভালো। আর এটা যদি নষ্ট হয়ে যায়,তবে সারা শরীর নষ্ট হয়ে যায়। আর এটা হলো কালব বা হৃদয়।’’[১৭]

৮। মানব জাতির আদর্শ শিক্ষক

মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিসালাতের যে গুরু দায়িত্ব নিয়ে এ বসুন্ধরায় আগমন করেছেন, তার সমুদয় শিক্ষার শিক্ষক স্বয়ং তিনি নিজেই। যে শিক্ষার মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর সেবা মানব দল তৈরি করেছেন রাসূল নিজেই ছিলেন তার শিক্ষক। আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে মানব জাতির শিক্ষক হিসাবেই প্রেরণ করেছেন। এ মর্মে তিনি বলেছেন, بعثت معلما আমি শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি।

এ শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে তৎকালীন আরবের অসভ্য ও বর্বর জাতি শিক্ষা ও সাহিত্যে চরম উন্নতির

শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। আর এই শিক্ষানীতি মানুষকে যেভাবে গড়ে তুলবার পরিকল্পনা দিয়েছে, তা হলো মানুষ এক লা শরীক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। রাসূলের মাধ্যমে প্রদত্ত বিধানের (দীন ও শরী‘আত) ভিত্তিতে তার দাসত্ব করবে। সে শুধু নিজের একার মুক্তির জন্যই কাজ করবে না, বরং আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের ভিত্তিতে গোটা বিশ্ব মানবতার পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ, মুক্তি ও উন্নয়নের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করবে। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতির ধারা বিধৃত করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ٢﴾ [الجمعة: ٢]

“তিনি (আল্লাহ) নিরক্ষরদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব শিক্ষা দেন। ইতোপূর্বে যদিও তারা প্রকাশ্যে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিল।” [সূরা আল-জুমু‘আ, আয়াত: ২]

৯। একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম

পৃথক্ৎ। তিনিই বিশ্ব মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। বিশ্বশান্তির প্রত্যক্ষ প্রতীক একমাত্র তিনিই। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে এক কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতি স্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন বিশ্ব মানবের জন্য একমাত্র আদর্শ। পবিত্র কুরআনের পরিপূর্ণ অনুকরণ ও অনুসরণ ব্যতীত হিদায়াতের আশা সুদূর পরাহত। মহান আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন:

﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ﴾ [ال عمران: ٣١]

“‘হে নবী! আপনি বলে দিন যে, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমার অনুকরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।’’ [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১]

তাই জীবন সংগ্রামের সাফল্যের ক্ষেত্রে ইসলামী জীবনাদর্শের সার্থকতা তথা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের একটি মাত্র পন্থাই রয়েছে, আর তা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের পরিপূর্ণ অনুকরণ ও

অনুসরণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন সর্বোত্তম সৃষ্টি, শ্রেষ্ঠতম পথিকৃৎ, আর তাঁর আদর্শ যেমন গ্রহণযোগ্য আদর্শ, তেমনিভাবে তার আদর্শই সম্পূর্ণ এবং সার্বজনীন। মানবজীবনের সব দিকের প্রতিই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। মানবজাতির সকল গোষ্ঠী, সমষ্টি এবং শ্রেণির জন্য তাঁর পুত পবিত্র জীবনে রয়েছে এক মহান আদর্শ। এ মর্মে আল-কুরআনে এসেছে:

﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾ [الاحزاب: ٢١]

“নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১]

১০। উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন

চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ। এটি তলোয়ারের চেয়েও তীক্ষ্ণ হয়ে মানব জীবনে ধ্বংস ও উন্নতির সোপান হিসাবে কাজ করে। সচ্চরিত্রবান ব্যক্তিত্ব সকলের নিকট সম্মানিত ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সে ধরণের উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এক মহা মানব।

বাল্যকালেই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কাওম কর্তৃক ‘আস সাদিক’ বা সত্যবাদী উপাধিতে ভূষিত হন। আমানতদার, দৃঢ়তা, সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা, সাধুতা, স্বভাবগত চারিত্রিক মাহাত্ম্য প্রভৃতি গুণে তিনি গুণান্বিত ছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর মর্যাদাকে জাহেলী সমাজেও সুউচ্চ করে দিয়েছেন।[১৮] জাহিলিয়াতের নাপাক ও খারাপ অভ্যাসসমূহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে স্বজাতির নিকট সবচেয়ে বেশি

প্রশংসনীয় গুণাবলী, উন্নত মনোবল, লাজ নম্র ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন তিনি। কিশোর বয়সের সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, নম্রতা ও ভদ্রতা, নিঃস্বার্থ মানবপ্রেম ও সত্যিকার কল্যাণ প্রচেষ্টা, চরিত্র মাধুর্য ও অমায়িক ব্যবহারের ফলে আরবগণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। অবশেষে আরবগণ তাঁকে আল-আমিন বা বিশ্বস্ত বলে ডাকতে থাকে। ফলে মুহাম্মাদ নাম অন্তরালে পড়ে গিয়ে তিনি আল-আমিন নামে খ্যাত হয়ে উঠলেন। নীতিধর্ম বিবর্জিত, ঈর্ষাবিদ্বেষে কলুষিত, পরশ্রীকাতর দুর্ধর্ষ আরবদের অন্তরে এতখানি স্থান লাভ করা ঐ

সময়ে খুবই কঠিন ছিল। অনুপম চরিত্রের মাধুর্যের অধিকারী হওয়ার কারণেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে তা সম্ভব হয়েছিল।[১৯] এমনকি তারা বিভিন্ন জটিল বিষয়াদি মীমাংসার ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত কামনা করত। কুরাইশ বংশের সকল গোত্রে কাবাগৃহে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে যে তীব্র বিতণ্ডা ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আশংকা দেখা দিয়েছিল তাও তিনি যুক্তিপূর্ণ উপায়ে অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে মীমাংসা করেছিলেন।[২০] এভাবে তিনি সর্বজনবিদিত ও নিরপেক্ষ একজন

বিচারকের মর্যাদায় আসীন হন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র মাধুর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে স্বয়ং মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ ٤﴾ [القلم: ٤]

‘‘নিশ্চয় আপনি উত্তম চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত।’’ [সূরা আল-কলম, আয়াত: 4]

মূলতঃ তাঁর চরিত্র হলো পবিত্র কুরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাঁর গোটা জীবন কাহিনী তথা সীরাত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁর চরিত্রে ছিল ভীতিজড়িত বিনয়, বীরত্ব ও সাহসিকতা মিশ্রিত লজ্জা, প্রচার

বিমুখ দানশীলতা, সর্বজনবিদিত আমানতদারী, বিশ্বস্ততা,কথা ও কাজে সত্য ও সততা। পার্থিব ভোগ-বিলাস থেকে সম্পূর্ণ বিমুখতা, নিষ্ঠা, ভাষার বিশুদ্ধতা ও হৃদয়ের দৃঢ়তা, অসাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা, ছোট-বড় সকলের প্রতি দয়া ও ভালবাসা, নম্র আচরণ, অপরাধীর প্রতি ক্ষমা প্রিয়তা, বিপদাপদে ধৈর্য ও সত্য বলার দুর্বার সাহসিকতা। তাঁর প্রিয় সহধর্মিণী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার দৃষ্টিতে كان خلقه القرآن ‘‘পবিত্র কুরআনই ছিল তাঁর চরিত্র।’’[২১]

১১। আকীদা-বিশ্বাসের সংশোধনকারী

তিনি মানব জাতিকে জাহেলিয়াতের যাবতীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন আকীদা-বিশ্বাস প্রভৃতির অজ্ঞতা থেকে ঈমানের আলোর দিকে পথ দেখিয়েছেন, তাঁর উপর অবতীর্ণ আল-কুরআন ও মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথের দিশা দিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ মর্মে পবিত্র কুরআনের সূরা ইবরাহীমে এসেছে:

﴿الٓرۚ كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِ رَبِّهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ ١﴾
[ابراهيم: ١]

“আলিফ, লাম, রা। এটি একটি গ্রন্থ। যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে

আলোর দিকে বের করে আনেন, পরাক্রান্ত ও প্রশংসার যোগ্য রবের নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে।’’ [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ১] অতঃপর, সব মানুষকে অন্ধকার তথা তাগুতের পথ থেকে বের করে আলোর পথ তথা সরল সঠিক পথে আসার জন্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।’’

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের উচ্চ সোপানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর আদর্শ শুধু স্বীয় অনুসারীদের হিদায়াত লাভের মাধ্যমই ছিল না বরং তাঁর উম্মাতের বিকীরিত হিদায়াত দ্বারা অন্যান্য উম্মতও অন্ধকার হতে

আলোর পথের দিশা পেতো। তাঁর সত্তাগত আবির্ভাবের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ٢﴾ [الجمعة: ٢]

‘‘তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের নিকট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে। তাদেরকে পবিত্র করবে এবং শিক্ষা দিবে কিতাব ও হিকমত।’’ [সূরা আল-জুমু‘আ, আয়াত: ২]

১২। আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষক

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে সর্বপ্রথম আল্লাহর বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানান। এক আল্লাহর আহ্বান মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করে। রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালোর ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, তাঁর সাথে কোনো শরীক নেই। তিনি চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্ববিষয়ে তিনি অধিক জ্ঞাত, তিনি সর্বময় ক্ষমতার আঁধার। তাঁর ইশারায় রাতদিন আবর্তিত হয়। আলোকিত হয় সারা বিশ্বময়,

আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী সমুদয় কিছুর তিনিই স্রষ্টা।[২২] তিনি এসব কিছু সৃষ্টি করে আমাদের ওপর বিশাল অনুগ্রহ করেছেন। মানুষের প্রত্যাবর্তনস্থল মূলতঃ তাঁরই দিকে। এসব বিষয়ের সমুদয় জ্ঞান লাভের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎকালীন সমাজের মানুষকে আহবান জানিয়েছিলেন। যেহেতু তারা তখন আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করত, গাছ-পালা, তরু-লতা, মূর্তি, পাথর প্রভৃতির পূজায় তারা নিজেদের নিয়োজিত করত। আদি যুগে উত্তর ও দক্ষিণ আরবের মরু ও পাহাড়ী অঞ্চলে এরূপ বস্তুপূজার নানা

প্রকার নিদর্শন প্রত্নতত্ত্ববিদরা উদঘাটন করেছেন। ফিলিপ হিট্টির মতে, মস্তবড় এরূপ অন্ধবিশ্বাস ভিত্তিক ধর্মীয় অনুভূতি মরুদ্যানের অধিবাসীদেরকে কল্যাণকর দেব-দেবী পূজায় ও তীর্থস্থান পূজায় নিবিষ্ট করে।[২৩] মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাওহীদ বাণী তাদের এসব বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে। আল্লাহর অনুপম সৃষ্টি ও অসংখ্য নি‘আমতরাজি নিয়ে একটু ভেবে দেখার জন্য তিনি স্বজাতিকে উদাত্ত আহবান জানান। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে এসেছে:

﴿قُلۡ أَرَءَيۡتُمۡ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمُ ٱلَّيۡلَ سَرۡمَدًا إِلَىٰ يَوۡمِ
ٱلۡقِيَٰمَةِ مَنۡ إِلَٰهٌ غَيۡرُ ٱللَّهِ يَأۡتِيكُم بِضِيَآءٍۚ أَفَلَا تَسۡمَعُونَ
٧١ قُلۡ أَرَءَيۡتُمۡ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرۡمَدًا
إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ مَنۡ إِلَٰهٌ غَيۡرُ ٱللَّهِ يَأۡتِيكُم بِلَيۡلٖ تَسۡكُنُونَ
فِيهِۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ ٧٢ وَمِن رَّحۡمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيۡلَ
وَٱلنَّهَارَ لِتَسۡكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِهِۦ وَلَعَلَّكُمۡ
تَشۡكُرُونَ ٧٣﴾ [القصص: ٧١، ٧٣]

‘‘হে রাসূল! আপনি বলে দিন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ যদি রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি তবুও কর্ণপাত করবে না? আর আল্লাহ যদি দীনকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে

আছে যে তোমাদেরকে রাত্রিদিন করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে, তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবে না? তিনি স্বীয় অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।” [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৭১-৭৩] এভাবে তিনি আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে তাদের উপাস্যদের সাথে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ ছুড়ি দিলেন। কিন্তু তথাপিও তারা অনুধাবন করতে সক্ষম হল না। পরকাল দিবসে তাদের উপাস্যদের কাছ থেকে প্রমাণ চাওয়া হবে। তখনি তারা তা বুঝতে ও অনুধাবন করতে পারবে, অথচ সেদিন তাদের

অনুভূতি কোনো কাজে আসবে না।’’[২৪]

১৩। আল্লাহর ইবাদতকারী ও তাগুতের অস্বীকারকারী

সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে পরিচয় করে দিতে এবং স্রষ্টার ইবাদতের দিকে আহবান জানানো ছিল নবী-রাসূলদের অন্যতম কাজ। আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন না করে একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥﴾ [الانبياء: ٢٥]

“আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলকে পাঠিয়েছি তাকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছি যে, নিশ্চয় আমি ব্যতীত তাদের কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২৫] কিন্তু কালের বিবর্তনে মানুষ আল্লাহর ইবাদত থেকে বিমুখ হয়ে বিভিন্ন দেব-দেবী, গাছ, সূর্য, চন্দ্র, তারকা প্রভৃতির ইবাদতে মশগুল হয়ে পড়ে। ফলে আল্লাহ তা’আলা তাদেরকে তাঁর ইবাদতের দিকে ধাবিত করতে এবং তাগুতকে অস্বীকার করার আহ্বান বার্তা দিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেন। সে কারণে কিছু লোক

হিদায়াতপ্রাপ্ত হলো এবং কিছু সংখ্যক লোক গোমরাহীর পথে রয়ে গেল। তিনি (রাসূল) তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এবং এর মাধ্যমেই তাদের একমাত্র সফলতা নিহিত রয়েছে, এ মর্মে ঘোষণা দিয়েছেন।[২৫]

১৪। সহমর্মিতার হাত বাড়াতে উদ্বুদ্ধ করেছে

যুলুম নির্যাতন একটি সমাজের অন্যতম ব্যাধি। এর মাধ্যমে সাংঘাতিকরূপে সমাজের আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা নষ্ট হয়। সমাজের মানুষ

শাসিত ও শোষিত হয়ে দু‘শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক শ্রেণীর মানুষ শোষকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে অপর শ্রেণির ওপর অন্যায়ভাবে যুলুম নির্যাতন চালাতে থাকে। ইসলাম মানবজাতির শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্যে সকল প্রকার যুলুম নিষিদ্ধ করেছে এবং এর বিপরীতে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতার হাত বাড়াতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবক বয়সেই যুলুমের বিরুদ্ধে আপোষহীন ছিলেন। তারই ফলশ্রুতিতে তিনি ২০ বছর বয়সে ‘হিলফুল ফুযুল’ নামক শান্তিসংঘে

যোগ দিয়েছিলেন, পরবর্তীতে এসবের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে ইসলাম জিহাদকে ফরজ করেছে এবং রিসালাতের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে সেটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا لَكُمۡ لَا تُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلۡوِلۡدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا مِنۡ هَٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهۡلُهَا وَٱجۡعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجۡعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٥﴾ [النساء: ٧٥]

“তোমাদের কী হয়েছে! তোমরা কেন আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করছ না? অথচ নির্যাতিত নারী পুরুষ, শিশু যারা চিৎকার দিচ্ছে এ বলে, হে আমাদের রব!

আপনি আমাদের এ যালিম সম্প্রদায় হতে মুক্তি দিন, আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক পাঠান এবং সাহায্যকারী মনোনীত করুন।’’ [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৭৫] এরই ফলশ্রুতিতে কাফিরদের সাথে বিভিন্ন সংঘাত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এমনকি সশরীরে নিজে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হন।

১৫। মানুষের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা

কোনো জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য যে কাজটি সবচেয়ে বেশি

ভূমিকা পালন করে তা হলো, পারস্পরিক যুলুম-নির্যাতন। এর মাধ্যমে মানুষ অন্যায় ও অসত্যের পথে পা বাড়ায়। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করে। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পথভ্রষ্ট হয়। যুগে যুগে এ সব যুলুম-নির্যাতনের ব্যাপারে নবী রাসূলগণের কণ্ঠ ছিল খুবই উচ্চকিত। তারা যুলুম নির্যাতনের বিপরীতে ইনসাফ ও সুবিচার সমাজে কায়েম করেছেন। মানুষের মাঝে যখনই কোনো মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল তখনই রাসূলগণ কিতাব ও মীযান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুবিচার কায়েম করে যুলুমের মূলোৎপাটন করেন। আমাদের প্রিয়

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও যুলুম নির্যাতনের চরম পর্যায়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং এর বিপরীতে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। নবুয়ত লাভের পূর্বে যুবক বয়সেই তিনি সমাজ হতে যাবতীয় অন্যায়-অবিচার, যুলুম-নির্যাতন ও অসত্যকে দূর করার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজেও বিচারকের আসনে সমাসীন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ফলে বহু বিবাদ নিরসনে স্বয়ং তাঁর শত্রুরাও তাঁকে বিচারক হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য হয়। তিনি সমাজে ও রাষ্ট্রের স্থায়ী সুবিচার প্রতিষ্ঠা

করতে সক্ষম হন। এ মর্মে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَأَنزَلۡنَا ٱلۡحَدِيدَ فِيهِ بَأۡسٞ شَدِيدٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلۡغَيۡبِۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٞ ٢٥﴾ [الحديد: ٢٥]

“নিশ্চয় আমরা আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়নীতি যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। তাদের প্রতি আমরা লৌহদণ্ড (রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব) দিয়েছি, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের জন্য অনেক কল্যাণ।” [সূরা

আল-হাদীদ, আয়াত: ২৫] অতএব, সমাজ থেকে যাবতীয় অন্যায়-অত্যাচার অপনোদন করে সুবিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন হয়েছিল। যখনই তিনি তা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছেন তখন মুমিনগণ তার অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিয়েছে।[২৬]

১৬। আখিরাতের জীবনকে অগ্রাধিকার দান

দুনিয়ার এ জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। এখানে মানুষ যদি ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে যায়, তাহলে পরকালীন জীবনে এর চরম মূল্য দিতে হবে। দুনিয়ার প্রতি

আসক্তি মানুষকে অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন ও যাবতীয় অবৈধ পথে পা বাড়াতে সহায়তা করে। অপরদিকে আখিরাতের চিন্তা মানুষের মাঝে আল্লাহর ভালবাসা, আল্লাহভীতি, সৎকর্ম ইত্যাদি কাজে উৎসাহ যোগায়, পবিত্র কুরআনে পার্থিব জীবনকে খেল-তামাশার বস্তু হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, তদুপরি মানুষ এর পিছনে পাগলপারা হয়ে ছুটছে, লাগামহীন জীবন যাপন করছে এবং সীমাহীন ভোগে বিভোর হয়ে পড়ছে। মুমিনের জন্য এ পার্থিব জীবন শুধুমাত্র পরীক্ষার বস্তু বৈ কিছুই নয়। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

ওয়াসাল্লাম মানুষকে আখিরাতের জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে দুনিয়ার জীবনে প্রস্তুতিমূলক নেক আমল সম্পন্ন করার পথে চলতে সাহায্য করে অন্যথায় যে কোনো সময় তাগুতের প্ররোচনায় প্রতারিত হতে পারে। এ মর্মে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলছেন:

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيۡنَيۡكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعۡنَا بِهِۦٓ أَزۡوَٰجٗا مِّنۡهُمۡ زَهۡرَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا لِنَفۡتِنَهُمۡ فِيهِۚ وَرِزۡقُ رَبِّكَ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰ ١٣١﴾ [طه: ١٣١]

‘‘আমরা তাদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি

সেসব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার রবের দেওয়া রিযিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।’’
[সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ১৩১]

অতএব, মানুষের ভোগের সামগ্রী নগণ্য ও ক্ষণস্থায়ী, আর আল্লাহর নিকট যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। এ মর্মে সূরা আল-কাসাসে এসেছে:

﴿وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيۡءٖ فَمَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتُهَاۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ٦٠﴾
[القصص: ٦٠]

‘‘তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা এবং আল্লাহর নিকট যা আছে তা

উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?’’ [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৬০]

১৭। বিনয় ও নম্রতার মূর্ত প্রতীক

বিনয় ও নম্রতা এমন একটি গুণ, যার মাধ্যমে অন্যের নিকট খুব সহজেই গ্রহণযোগ্য হিসেবে দা‘ঈ নিজের স্থান করে নিতে পারে। ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে এর ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। বিনয় একজন দা‘ঈর চারিত্রিক ভূষণ। বিনয়ের মাধ্যমে দা‘ঈ মানুষের নিকটবর্তী হয়ে যায়, ফলে দা‘ওয়াত উপস্থাপন সহজ হয় এবং সমাজের সকল শ্রেণির লোক তা

গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়: এর সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণিত হয়েছে:

﴿فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩﴾ [ال عمران: ١٥٩]

‘‘আপনি আল্লাহর করুণায় সিক্ত হয়ে তাদের প্রতি দয়াপরবশ না হয়ে যদি কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হতেন, তাহলে আপনার কাছ থেকে লোকজন দূরে সরে যেত। অতএব, আপনি তাদের ক্ষমা করুন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং যাবতীয় কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর

আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ভরসাকারীদেরকে পছন্দ করেন।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৯]

বিনয়ের মূর্ত প্রতীক হচ্ছেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ। বিনয় ও নম্রতা দ্বারাই তারা মানুষকে আপন করে নিয়েছেন। বিনয়ী ব্যক্তিকে আল্লাহ যেমন ভালবাসেন মানুষও তাকে পছন্দ করে। সকল মুমিনদের প্রতি বিনয়ী হবার ব্যাপারে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছিলেন।[২৭] এ মর্মে হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ان الله أوحى الى أن تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا ينبغى احد على احد»

‘‘আল্লাহর আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন এ মর্মে যে, তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে বিনয় নম্রতার আচরণ করে, যাতে কেউ কারো ওপর গর্ব ও গৌরব না করে এবং পরস্পর পরস্পরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে।”[২৮] বিনয় ও নম্রতার প্রভাবে আরবের এক বেদুঈন মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তার জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রেও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নম্র ব্যবহার লঙ্ঘিত হয় না। এ মর্মে হাদীসে এসেছে:

‘‘এক বেদুঈন মসজিদে নববীতে এসে প্রসাব করতে শুরু করে। এ দেখে সাহাবায়ে কেরাম তাকে ধমকাতে লাগলেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বারণ করে তাকে প্রস্রাব শেষ করার সুযোগ দিলেন। আর বালতি এনে পানি ঢেলে পরিষ্কার করান। অতঃপর লোকটিকে ডেকে নরমভাবে বলেন, ‘‘দেখ এটা মসজিদ, ইবাদতের স্থান। এখানে প্রস্রাব করা ঠিক না। তখন লোকটি তার নিজের ভুল বুঝতে পারল। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের

কথায় এতই প্রভাবিত হয় যে, প্রায়ই সে দু’আ করত, হে আল্লাহ! একমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আমাকে দয়া কর, অন্য কাউকে নয়।[২৯]

১৮। তাকওয়া সম্পন্ন মানুষ তৈরি করা

তাকওয়া হলো উত্তম চারিত্রিক ভূষণ, যা একজন দা‘ঈর জীবনে প্রতিফলিত হওয়া অত্যাবশ্যক। তাকওয়া মানুষকে যাবতীয় অন্যায়-অবিচার, অশ্লীলতা-বেহায়াপনা, প্রভৃতি হতে রক্ষা করে সৎকর্ম সম্পাদনে সাহায্য করে। এ গুণে গুণান্বিত দা‘ঈর প্রভাব মাদ‘উদের উপর খুব সহজেই পড়ে। যুগে

যুগে পৃথিবীতে প্রেরিত সকল নবী-রাসূল মানুষকে এ গুণের অধিকারী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাকওয়া ঢালস্বরূপ, যা মানুষকে পাপকাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিলকৃত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মুত্তাকীদের জন্যই হিদায়াতবর্তিকা। এ মহাগ্রন্থ থেকে তারাই উপদেশ গ্রহণ করে। অতএব, কুরআন অবতীর্ণের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষকে তাকওয়া বিষয়ে সচেতন করে দেয়া। পবিত্র কুরআনে তাই ধ্বনিত হচ্ছে,

﴿مَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لِتَشۡقَىٰٓ ٢﴾ [طه: ٢]

‘‘রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি কুরআন অবতীর্ণ করি নি। এটা তাদের জন্য উপদেশস্বরূপ যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।’’ [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ১-২]

মানুষের পরিপূর্ণ সফলতা হচ্ছে পরকালীন সফলতা। আর এটা একমাত্র তাকওয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। সূরা ত্বা-হা‘তে এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلتَّقۡوَىٰ﴾ [طه: ١٣٢]

‘‘শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।’’ সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ১৩২]

এ তাকওয়া গুণে গুণান্বিত করার লক্ষ্যেই আল্লাহ তা‘আলা মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মানব জাতির জন্যে গাইড বুক হিসেবে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করেছেন। এটি মানুষকে তাকওয়ার পথ নির্দেশ করে চিরস্থায়ী জান্নাতে দীক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ যোগায় এবং জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে মুক্তি লাভের উপায় বাতলে দেয়। ফলে, এ মহামূল্যবান গ্রন্থে উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদানের পাশা-পাশি ভীতি সঞ্চারমূলক অসংখ্য বিধান ও বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে:

﴿وَكَذَٰلِكَ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَانًا عَرَبِيّٗا وَصَرَّفۡنَا فِيهِ مِنَ ٱلۡوَعِيدِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ أَوۡ يُحۡدِثُ لَهُمۡ ذِكۡرٗا ١١٣﴾ [طه: ١١٣]

‘‘অনুরূপভাবে আমরা আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি এবং এতে নানাভাবে সতর্কবাণী ব্যক্ত করেছি, যাতে তারা আল্লাহভীরু হয় অথবা তাদের অন্তরে চিন্তার খোরাক যোগায়।’’ [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ১১৩]

১৯। দীনকে বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা করা

সকল নবী-রাসূল এর দীন এক ও অভিন্ন, আর তা হলো ইসলাম। মহান আল্লাহর নিকট ইসলাম-ই একমাত্র

মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। যুগে যুগে এ আদর্শকে বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নবী-রাসূলগণ ব্রতী হন। পৃথিবীতে প্রচলিত মানবরচিত সকল মতাদর্শের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করত সে সকল আদর্শের অসারতা প্রমাণ করাই তাদের মহান লক্ষ্য। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার ব্যতিক্রম নন। তিনি সকল ধর্মের উপর ইসলামকে বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাঁর মাধ্যমেই এ দীন পরিপূর্ণতা লাভ করে। পবিত্র কুরআনে তাঁকে প্রেরণের

উদ্দেশ্যে বর্ধিত করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ ٩﴾ [الصف: ٩]

“তিনি সেই সত্তা যিনি হিদায়াত ও সত্য দীন সহকারে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যেন যাবতীয় মতাদর্শের উপর ইসলাম বিজয়ী আদর্শরূপে স্থান পায়। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করুক।” [সূরা আস-সাফ, আয়াত: ৯]

এ বিজয় ছিল বৈষয়িক, আধ্যাত্মিক, জ্ঞানগত এবং বর্ণনাগত। ইসলাম দলীল প্রমাণ এবং জ্ঞানগত শক্তি ও

যুক্তি দ্বারা প্রতিপক্ষকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। তিনি ছিলেন জ্ঞান ও দর্শনের উৎস। আকীদা-বিশ্বাস, রীতি-নীতি ও শিষ্টাচার, ইবাদত, লেন-দেন, বিবাহ-শাদী, রাষ্ট্রনীতি-পারিবারিক প্রশাসন, আম্বিয়া-ই কিরামের জীবনী ও পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিহাস সম্পর্কিত জ্ঞান দান করে মানুষকে ধন্য করেছেন। তাঁর আগমনের সময় সমগ্র বিশ্ব আমল ও আকিদা, ভ্রান্ত ধারণা, কুসংস্কার ও প্রথা প্রচলনের অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত ছিল। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের চিন্তা চেতনায় দাসত্ববোধ চাপিয়ে দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সকল কু-প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেন, আতঙ্ক ও আশঙ্কার পরিবর্তে শান্তি ও নিরাপত্তা, যুলুম-অত্যাচারের পরিবর্তে ন্যায় ও সুবিচার, গোত্র ও শ্রেণি বৈষম্যের পরিবর্তে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সহজ ও সরলপন্থা প্রবর্তন ও প্রচলন করে মানুষের স্কন্ধ হতে ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার দুর্বহ বোঝা অপসারণ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর এ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

﴿وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إِصۡرَهُمۡ وَٱلۡأَغۡلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتۡ عَلَيۡهِمۡۚ﴾ [الاعراف: ١٥٧]

“‘এবং সে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার ও শৃঙ্খল হতে, যা তাদের চেপে বসেছিল।’’ [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৭]

উপসংহার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবে পৃথিবীতে এক অভূতপূর্ব বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। তাঁর নবুওয়াত মানুষের ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা ও সামাজিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন বিশেষ অবদান রেখেছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে। তাঁর আগমনের সুবাদে

যুলুম-অত্যাচারের পরিবর্তে ন্যায় ও সুবিচার, মূর্খতার পরিবর্তে জ্ঞান ও ভব্যতা, অন্যায়-অপরাধের পরিবর্তে আনুগত্য ও ইবাদত, অবাধ্যতা ও দাম্ভিকতার পরিবর্তে বিনয় ও নম্রতা, স্বেচ্ছাচারী ও নিপীড়নের পরিবর্তে ধৈর্য এবং কুফর ও শিরকের পরিবর্তে ঈমান ও তাওহীদ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তাঁর নবুয়ত স্নেহ-দয়া, প্রেম-ভালবাসা ও অনুগ্রহ-অনুকম্পার বাণী শুনিয়েছে। তাঁর দা‘ওয়াত, মানব জীবন ও মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যে অলৌকিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে, তার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। তিনি স্বীয় শিক্ষার বদৌলতে মানবতাকে

অধঃপতনের অতল গহ্বর হতে উদ্ধার করে অগ্রগতি ও উন্নতির চরম শিখরে সমাসীন করেছেন। তিনি ঈমানের আলো ও জ্যোতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর আবির্ভাবের ফলে মানুষের আত্মা আলো লাভ করেছে এবং শির্ক, কুফর ও ভ্রষ্টতার অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে। তাঁর আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ায় প্রচলিত ও প্রচারিত যাবতীয় মতাদর্শের অসারতা প্রমাণ করে দীনের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দেয়া এবং দীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে মানুষের মাঝে তুলে ধরা। তাই তিনি হিদায়াত ও সত্য দীন সহকারে এ ধরাধামে আগমন করেছেন। এ মর্মে কুরআনে এসেছে:

﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ﴾ [التوبة: ٣٣]

‘‘তিনি সেই সত্তা (আল্লাহ) যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে অপরাপর সকল দীন ও মতাদর্শের ওপর একে (ইসলামকে) বিজয়ী ঘোষণা দেওয়া যায়।’’ [সূরা আস-সাফ, আয়াত: ৯]

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পথ প্রদর্শন করেছেন, বিশ্ব মানবতার কল্যাণের জন্য যে পথ নির্দেশনা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করতে পারলেই পৃথিবীতে প্রকৃত সুখ ও শান্তি আসতে বাধ্য। তাঁর রিসালাতেই

সার্বজনীন প্রভাব ফেলতে পেরেছে বিশ্বচরাচরে। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। মাইকেল হার্ট 'দ্য হানড্রেড: এ র্যাংঙ্কিং অব দ্য মোস্ট ইনফ্লুয়েনশিয়াল পার্সনস ইন হিস্ট্রি' গ্রন্থে বিশ্বের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী একশ জন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠত্বের ক্রমানুযায়ী বিন্যাস করেছেন। তালিকার প্রথমেই তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে লিখেছেন:

My choice of Muhammad to lead the list of the worlds most influential persons many Surprise some readers and may be questioned by others. But

he was the only man in history who was Supremely Successful on both the religious and Secular Levels.

‘পবিত্র কুরআনের আলোকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত’ গ্রন্থটিতে আল-কুরআনের আলোকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের উদ্দেশ্য, তাঁর রিসালাত-সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক বক্তব্য এবং রিসালাতের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

[১] অধ্যাপক মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, আকায়েদুল ইসলাম, ঢাকা: কুতুবখানায়ে রশীদিয়া, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন, ১৯৯৭, পৃ. ৪৭।

[২] ড. ইবরাহীম মাদকুর, আল-মু‘জামুল ওসীত, দিল্লী, দারুল কলম, তাবি, পৃ. ৩৪৪।

[৩] আল-মুনজিদ লুইস মালুক আল ইয়াসু’য়ী, ২৪তম সংস্করণ, বৈরুত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তাবি, পৃ. ২০৯।

[৪] মুনির আল বা‘লাবাক্কী, আল-মাওরিদ, বৈরুত: দারুল ইলমি লিল মালাইন, ১৯৭৬, পৃ. ৫৮৩।

[৫] মু‘জামু লুগাতিল ফুকাহা, পৃ. ২২২।

[৬] মনিরি আল-বালাবাক্কী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৩।

[৭] আবু বকর যাবের আল-জাযায়েরী, মিনহাজুল মুসলিম, (জিদ্দা: দারুশ শুরুক, ১৯৯০), পৃ. ৫২।

[৮] মানুষ কখন এক উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেন, একই উম্মত বলতে একই ধর্মের অনুসারী বুঝানো হয়েছে। ইবন কা‘ব ও ইবন যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিমত হলো : মানুষ বলতে এখানে আদম সন্তানকে বুঝানো হয়েছে।

তাদের ধর্মীয় ঐক্য ছিল সে সময়, যখন আল্লাহ তা‘আলা আদম সন্তা-নদেরকে তাদের পিতা আদম ‘আলাইহিস সালাম-এর পৃষ্টদেশে থেকে বের করে তাদের নিকট হতে আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি আদায় করেছিলেন। (ইমাম কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০)।

প্রখ্যাত তাফসীরকারক ইবন আব্বারাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আদম ‘আলাইহিস সালাম ও নূহ ‘আলাইহিস সালাম পর্যন্ত যে দশটি যুগ অতিক্রান্ত হয়েছিল সে সময়কার মানুষ সঠিক ধর্মের ওপর ছিল। অতঃপর তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা

দলিে আল্লাহ নূহ ‘আলাইহিস সালাম ও পরবর্তী কালের নবীগণকে প্রেরণ করেন। (মুহাম্মদ আলী আস্-সাবুনী, আন্ নবুয়্যাত ওয়াল আম্বিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯)।

[৯] মহান আল্লাহ বলেন ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا ٤٥ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذۡنِهِۦ وَسِرَاجٗا مُّنِيرٗا ٤٦﴾ [الاحزاب: ٤٥، ٤٦] ‘‘হে নবী! আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনরূপে এবং আল্লাহর নির্দেশে তার প্রতি আহবানকারী উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।’’ [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৪৫-৪৬]

[১০] আল্লাহর ﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ عَلَىٰ فَتۡرَةٖ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٖ وَلَا نَذِيرٖۖ فَقَدۡ جَآءَكُم بَشِيرٞ وَنَذِيرٞۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ١٩﴾ [المائدة: ١٩] ‘‘হে আহলে কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল আগমন করেছেন, যিনি রাসূলগণের বিরতির পর তোমাদের কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা একথা বলতে না পার যে, আমাদের কাছে কোন সুসংবদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শক আগমন করে নি। অতএব, তোমাদের কাছে সুসংবাদ দাতা ভীতিপ্রদর্শক এসে গেছে আর তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।’’ [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ১৯]

[১১] এ মর্মে পবিত্র কুরআনে এসেছে, ﴿وَلَوۡلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُۢ بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوۡلَآ أَرۡسَلۡتَ إِلَيۡنَا رَسُولٗا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٤٧﴾ [القصص: ٤٧] [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৪৭]

[১২] সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭।

[১৩] তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৯৩, কিতাবুল ইলম।

[১৪] ইবনুল মানজারী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খণ্ড (কায়রো: ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, ১৯৬৮, পৃ. ৪১৭।

[১৫] ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৩০৩।

[১৬] এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন: ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَانًا عَرَبِيّٗا وَصَرَّفۡنَا فِيهِ مِنَ ٱلۡوَعِيدِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ أَوۡ يُحۡدِثُ لَهُمۡ ذِكۡرٗا ١١٣ ﴾ [طه: ١١٣] [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ১১৩]

[১৭] সহীহ মুসলিম।

[১৮] সূরা আল-ইনশিরাহ, আয়াত: 8।

[১৯] এ মর্মে সীরাতে ইবন হিশামে বর্ণিত আছে: فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم و يكلأه يحفظ وبحوط من اقذار الجاهلية لما يريد به من كرامةه ط رسالةه حةى بلغ إن كان رجال وأفضل قومه ومرؤةو اجسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم حوارا واعظمهم حلما واصدقيم حديثا واعظمهم امانة وابعدهم من المفحش والأ خلاق التى ةدنس الر جال ةنز ها وةكرما اسمه فى مه الأمين لما جمع الله فيه من الأمور

الصالحة ‘‘অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থায় বয়ঃপ্রাপ্ত হতে লাগলেন যে, স্বয়ং আল্লাহ তাঁকে হিফাযত ও তাঁর প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং জাহিলিয়্যাতের সমস্ত অনাচার থেকে তাঁকে পবিত্র রাখেন। কেননা তাঁকে নবুওয়াত ও রিসালাতের উচ্চ মর্যাদায় আসীন করা ছিল মহান আল্লাহর অভিপ্রায়। ফলে তিনি একজন নম্র, ভদ্র, চরিত্রবান, উত্তম বংশীয়, ধৈর্যশীল, সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যক্তি হিসাবে সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। অশ্লীলতা ও অনৈতিকতা হতে সর্বদা দূরে থাকতেন। এ সকল উত্তম ও নৈতিক

গুণাবলীর কারণে স্বজাতির মধ্যে তিনি আল-আমিন খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। (ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২)

[২০] আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, আর রাহীকুল মাখতুম, অনু খাদিজা আখতার রেজায়ী (আল-কুরআন একাডেমী লন্ডন, ১ম সংস্করণ, ২০০৩) পৃ. ৭৮।

[২১] ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪৬।

[২২] এ মর্মে পবিত্র কুরআনে সূরা ত্বাহায় এসেছে: ﴿لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا وَمَا تَحۡتَ ٱلثَّرَىٰ ٦ وَإِن تَجۡهَرۡ

بِٱلۡقَوۡلِ فَإِنَّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخۡفَى ٧ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ لَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ ٨﴾ [طه: ٦، ٨] ‘‘আর আসমান সমূহ ও যমীনরে উপর অবস্থতি যাবতীয় বস্তু এবং যা কছিু তার মাঝে ও মাটরি নীচে অবস্থতি সব কছিুর মালকি তনিইি। তুমি উচ্চ কণ্ঠে যা বল তা সহ যাবতীয় গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই জাননে। আল্লাহ, তনিি ব্যতীত অন্য কোেন ইলাহ নইে। তাঁর অনকে উত্তম নাম রয়ছে।ে” [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৬-৮]

সূরা আল-কাসাসে এসছে:ে ﴿وَرَبُّكَ يَعۡلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمۡ وَمَا يُعۡلِنُونَ ٦٩ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ لَهُ ٱلۡحَمۡدُ فِي ٱلۡأُولَىٰ وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَلَهُ ٱلۡحُكۡمُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٧٠﴾ [القصص: ٦٩، ٧٠]

‘‘আপনার রব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন। তাদের কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহ পবিত্র এবং তারা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি উর্ধ্বে। তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে আপনার রব তা জানেন।’’ [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৬৮-৭০]

[২৩] P.K Hitti, History of The Arabs, opcit, p ৯৭

[২৪] আল্লাহ বলেন: ﴿وَيَوۡمَ يُنَادِيهِمۡ فَيَقُولُ أَيۡنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمۡ تَزۡعُمُونَ ٧٤ وَنَزَعۡنَا مِن كُلِّ أُمَّةٖ شَهِيدٗا فَقُلۡنَا هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلۡحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ ٧٥﴾ [القصص: ٧٤، ٧٥] “সে দিন আল্লাহ তাদেরকে

ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার সাথে শরীক মনে করতে তারা কোথায়? প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি একজন সাক্ষ্য আলাদা করব; অতঃপর বলব, তোমাদের প্রমাণ আন। তখন তারা জানতে পারবে যে, সত্য আল্লাহর এবং তারা যা পড়ত তা তাদের কাছ থেকে উন্তর্হিত হয়ে যাবে।” [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৭৪-৭৫]

[২৫] আল্লাহর বাণী: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ لَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدۡنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَيۡءٖ نَّحۡنُ وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمۡنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَيۡءٖۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ فَهَلۡ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ ٣٥﴾ [النحل: ٣٥] “নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এ

মর্মে যে, তারা আমার ইবাদত করবে এবং তাগুত থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর তাদের কিছু সংখ্যক হিদায়াতপ্রাপ্ত হলো এবং কিছু সংখ্যক গোমরাহ হয়ে পড়ল।’’ [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৫]

[২৬] সূরা আন-নূর, আয়াত: ৫১।

[২৭] আল্লাহ বলেন: ﴿وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢١٥﴾ [الشعراء: ٢١٥] ‘‘যারা তোমার অনুসরণ করে সে সকল বিশ্বাসীদের প্রতি বিনয়ী হও।’’ [সূরা আশ শু‘‘আরা, আয়াত: ২১৫]

[২৮] ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল অযু, পৃ. ৩২২।

[২৯] মুহাম্‌মাদ ইবন ইসমাঈল, সহীহুল বুখারী, কিতাবুল অযু, হাদীস নং ২১৩।